



নানা রংয়ের সম্পর্কগুলো

মনুষ্য দর্শন - ১ (সংশোধিত সংস্করণ)

হিফজুর রহমান

উপক্রমিকা.

মাঝে মাঝে মনে হয় এই আমি জীবনানন্দ দাসের কবিতার মতো “হাজার বছর ধরে হাঁটিতেছি এই পৃথিবীর পথে..”। এর মধ্যে আমাদের মতো কালো এবং অন্য দেশের ধলো মিলিয়ে অনেক মানুষেরই সাথে আন্তঃসংযোগ সাধিত হয়েছে। কিন্তু, তাদের অনেকেরই আচরণে অবাক হয়েছি বারবার। ভেবেছি কেন এমনটা হয়! অদ্ভুত সব ঘটনার এবং আচরণের সম্মুখীন হয়েছি প্রায় সারাটা জীবন ধরেই। তবে, নিজেও যে খুব শুদ্ধ আচরণ করে গেছি তাওতো নয়। পুরো সময়টাই চলে গেল নিজেকে এবং মানুষদের চিনতে চিনতে। এই উত্তর পঞ্চাশে এসে মনে হয় নিজেকেই চেনা হলোনা এই জীবনে, অন্যদের চিনবো কি করে?

কর্ণফুলির প্রধান সাম্পানওয়ালার সাথে কথা বলতে বলতে একদিন নিজের অনেক দুঃখের কথা বলেই ফেললাম অকপটে। গত প্রায় ছ’মাস অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী থাকায় ওইসব দুঃখ যেন আরো প্রবল হয়ে ওঠে। তখনই মনে হলো ভারাক্রান্ত এই জীবনে যতো মানুষকে দেখেছি তাদের নেতিবাচক এবং ইতিবাচক চরিত্র নিয়ে একটা রচনা তৈরী করে ফেলবো, যার নাম হবে মনুষ্য দর্শন। কয়েকটা ঘটনা প্রধান সাম্পানওয়ালার বনি আমিনকে বললাম এবং আমার অভিপ্রায়ের কথাও জানালাম। বনি সঙ্গে সঙ্গেই বললো, বাবুল ভাই (আমার ডাক নাম) লিখে ফেলেন। আপনার ধারাবাহিক উপন্যাসটা শেষ হলেই ওটা ছাপাতে শুরু করবো। এই রকম শর্তহীন উৎসাহ বনি যোগায় বলেই লেখক হিসেবে আমার পুনর্জন্ম হয়েছে বলা চলে।

বনির উৎসাহ পেয়েই কিছুদিন আগে “কষ্ট নেবে কষ্ট” শীর্ষক আত্মকথনে কিছুটা অন্তর্জালার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ফেললাম। ওই লেখায় যাদের সম্পর্কে বলেছি তাদের একসময় খুবই ভালোবাসতাম, পছন্দ করতাম। আর তাই ওদের কথাই লিখে ফেললাম সবার আগে অনেকই কষ্টে। ভেবেছিলাম, তাদের কাছ থেকে কোন না কোন রকম প্রতিবাদ পাবো। কিন্তু, পাইনি। বনি পেয়েছে কি না জানিনা। ওই লেখারই এক জায়গায় নিয়মিতভাবে এই মনুষ্য দর্শন সংক্রান্ত লেখাটি পরিবেশন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলাম। বনিও তাড়া দিতে লাগলো। তাই এই বালখিল্য লেখাটি পরিবেশন করার সাহস পেয়ে গেলাম।

কিভাবে লিখবো, কি লিখবো এই সব ভাবতে ভাবতে ঠিক করে ফেললাম যতোরকম চরিত্র আমার এই জীবনে দাগ কেটে গেছে তাদের কথাই লিখবো অকপটে। যারা জীবিত আছেন তাদের ভালো-মন্দ উভয়ই উঠে আসবে এই লেখায়। তাহলে তারা তাদের চরিত্রের নেতিবাচক কথা লেখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সুযোগ পাবেন। আর মৃত যারা, তাদের কেবলই ভালো দিকগুলো তুলে ধরবো। আপনারা বলতে পারেন, তুমি কে হে অন্যের মন্দ কথা বলার? তুমি কি ধোয়া তুলসী পাতা? আমার জবাব হচ্ছে, না, আমি মোটেও ধোয়া তুলসী পাতা নই। আগের লেখাতেই বলেছি অনেক দোষে, অনেক অপরাধে ক্লিষ্ট, ক্লিনু আমি। তবে, কারো কাছ থেকে উপকার পেয়ে তাকে একেবারেই ভুলে যাওয়া এবং নিমকহারারী চূড়ান্ত নিদর্শন দেখানোর মতো অপকর্মের দোষে আমি দুঃস্থ এই কথাটা বোধহয় কেহই বলতে পারবেননা। তারপরও আমার সম্পর্কে কেউ কোন কথা বলতে চাইলে অনায়াসেই কর্নফুলীর আশ্রয় নিতে পারেন তারা। আমি এখনই কর্নফুলীর প্রধান সাম্পানওয়ালাকে অনুরোধ জানিয়ে রাখছি, সেরকম কেউ লিখতে চাইলে তিনি যেন অতি অবশ্যই সেই লেখাকে কর্নফুলীতে স্থান করে দেন। কারণ, সেটাই হবে সত্য আচরণ রীতি। তবে, মনুষ্য দর্শনের কথা লিখতে লিখতে আমার সম্পর্কেও অনেক কথাই উঠে আসবে। সেটা থেকে আপনারা হয়তো খানিকটা হিফজুর দর্শনও করে ফেলতে পারেন।

এই মনুষ্য দর্শনে কোন দর্শন (ফিলজফি) নেই। আছে কেবলই দেখার গল্প। তবে সেটা থেকেও কেউ দর্শনের জারক নিঃসারিত করতে চাইলে খুব ভুলও বোধহয় হবেনা। দর্শন নেই কোথায়? অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন অর্থনীতির দর্শন খুঁজে বের করেই তো নোবেল জয় করে আনলেন এই হত দরিদ্র বাঙালীর জন্যে। অর্থনীতির শিক্ষক অমর্ত্য সেন এখন ট্রিনিটিতেই সম্ভবতঃ পড়াচ্ছেন দর্শন। আর মানুষের জীবন ও আচরণের মধ্যে যে দর্শন আছে তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত আর কোথায়?

একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। এক ধনী ব্যবসায়ির সাথে পরিচয় হয়েছিল নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি, নাম সুবীর দে। সেই সুবীর দা'কে ইংরেজী ভাষায় “স্টিংকিং রীচ” বললেও ভুল বলা হবেনা। তখন আমি ঢাকাস্থ অস্ট্রেলীয় দূতাবাসে পলিটিকাল/ইকনমিক রিসার্চ অফিসার হিসেবে কাজ করছি। বাঙালীদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার হবার ফলে বাড়তি কিছু সুযোগ সুবিধা তো ভোগ করতামই। আর ওই পদবীর কারণে ঢাকার বা বাংলাদেশের বাজারে আমার মূল্যমানও খুব একটা কম ছিল না। ওই সুবাদে লাক্সমা গার্মেন্টস-এর অন্যতম মালিক সুবীর দে'র সাথে পরিচয় হয়েছিল। এই সুবীর দে ঢাকার প্রথম লেক্সাস জিপ ব্যবহারকারী। তিনি তার নিজের জন্যে এবং তার অংশীদার-এর জন্যে দুটো লেক্সাস নিয়ে এসেছিলেন সেই সময়। আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে সুবীর দে'র পরিচয়। সুবীর যাবেন অস্ট্রেলিয়ায়, ভিসা লাগবে। তাই বন্ধুর সম্পর্কের সেতু ধরে তিনি এলেন আমার কাছে। ভিসা তিনি এমনিই পেতেন, নিজ গুনে। সেই থেকেই ঘনিষ্ঠতা। অস্ট্রেলীয় দূতাবাসে যতোদিন ছিলাম, সুবীরদার খানমন্ডির বাসায় যে কোন অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। আমার ড্রাইভার নেই এই অজুহাতে কোন কোন সময় তার বাসার কোন অনুষ্ঠানে না যেতে চাইলে আমাকে বাসা থেকে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি তার অতি দামি গাড়িও পাঠিয়ে দিতেন। সেই সুবীর দা আমাকে একেবারেই ভুলে গেলেন অস্ট্রেলীয় দূতাবাসের চাকুরী ছাড়ার পর। বিশদ হয়তো পরে আবার বলবো।

আমার এই জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ “অফিস অব প্রফিট” ছেড়েছি অস্ততঃ তিনবার। আর এই তিনবারেই অনেক বসন্তের কোকিল ঝরে গেছে বিনা দ্বিধায়। তারা যে বসন্তের কোকিল ছিলেন সেটা বুঝতে আমার অনেকই সময় লেগেছে। এরকম অনেক বসন্তের কোকিল অস্ট্রেলিয়াতেও বাস করেন। তাদের মধ্যে এখনই মনে পড়ছে একজন এনাম হকের কথা। তার সম্পর্কেও লিখবো পরে। আবার অনেক ভালো মানুষও আছেন, যারা তাদের ভালোবাসা দিয়ে আমার জীবনকে ভরপুর করে দিয়েছেন। সেরকম একজন হচ্ছে সোহেল। গায়ক হিসেবে সোহেল সিডনীতে সমধিক পরিচিত বলে শুনেছি। ও আমাকে মামা বলে ডাকে তার এক তস্য মামা আমার তথাকথিত বন্ধু হবার কারণে। সেই বন্ধু দেলোয়ার (সিডনীতে ডেল বলে পরিচিত) এখন বোধহয় আমার নামও মনে করতে পারবেন না, সিডনির ওই সুন্দর ভূবন থেকে। কিন্তু, সোহেল এখনো দূরভাষে যখন মামা বলে ডেকে ওঠে তখন মনে হয় জীবনের সবটাই বোধহয় কর্কশ ও নিষ্ঠুর নয়। একটু লেখার জন্যে এই ক্ষুদ্র লেখককে বনি যখন লেখা পাঠাবার জন্যে অতি নিষ্ঠুরভাবে ধাতানি দেয় তখনো মনে হয়, না ভালোবাসা, শুভেচ্ছা শব্দগুলোর অপমৃত্যু হয়নি এখনো। তবে, ডেল বা তার ভাই নবি আজার খান, নবি খানের সন্তান মামুন খান এরকম অনেকেরই কথা লিখবো একটু একটু করে।

গত এক মাস খুবই ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। শরীরের কথা খুব একটা ভাবছি না আর। বৃটেনের প্রতিষ্ঠান সেফারওয়র্ল্ড, ইউকে-এর হয়ে দুটো গবেষণা প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত এখন। প্রকল্পের উপজীব্য “পভাটি” ও “ইনসিকিউরিটি”। এক মাস প্রায় ঢাকার বাইরে থাকতে হবে, অক্টোবর ও নভেম্বর মিলিয়ে। ১১ টা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করতে হবে। সেই সাথে কিছু সার্ভে। এরই মধ্যে আমার এক তথাকথিত বন্ধু এবং বই দোকানী কাইউম মোহম্মদের একটা কথা শুনে একটু অবাকই হলাম। যার মাধ্যমে শুনেছিলাম, তিনি আমার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে আমি বলেছিলাম, এখন যা সব প্রতিক্রিয়া আছে লিখেই জানাবো।

এই কাইউমের সাথে সম্পর্ক আমার অনেক দিন থেকেই। আমার এক প্রকাশক পল্লব পাবলিশার্সের ম্যানেজার ছিল ও। ১৯৮৬ সালে ওর সাথে পরিচয়, পুস্তক প্রকাশনা সূত্রেই। ওইসময় বিখ্যাত

ঔপন্যাসিক মইনুল আহসান সাবের, শিল্পী মাশুক হেলাল, কবি তুষার দাশ এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত আরো সব শিল্পী-সাহিত্যিকের সাথে আমাদের একটা আড্ডা জমে উঠে। মাধ্যম ছিল পল্লব পাবলিশার্স ও কাইউম। বেশির ভাগ সময় সাবের-এর পিতা কবি আহসান হাবিবের মোহম্মদপুরের নিবাস, আমার শান্তিবাগের বাসা এবং কদাচিত মগবাজারের পানশালা পিয়াসীতে আমাদের জম্পেশ আড্ডা হতো। একসময় সাবের-এর পীড়াপীড়িতে আমাদের সম্বোধন আপনি থেকে তুমি এবং তুমি থেকে তুইতে নেমে আসে অনায়াসেই। এরপর ১৯৯১ সালেই সম্ভবতঃ সাবের ও কাইউমের পরিকল্পনামতো আমিও একটা প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিই। তখন আমি কাজ করছিলাম খবর গ্রুপে। ওখানেই এক বিকেলে আমার অফিসে সাবের, কাইউম ও আমি একটি মিটিং করে দিব্য প্রকাশ (দিব্য, সাবের-এর বড়ো ছেলের নাম) নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমাদের যেহেতু অর্থ ছিলনা তাই আমরা সেসময়ের ডিসি ফুড এবং বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক ইশতিয়াক আলম ও শঙ্ক কৰ্মকর্তা শাহবুদ্দীন নাগরীকে আমাদের সাথে যুক্ত করবো বলেও সিদ্ধান্ত নিই। এখন আমার মনে হয়, আমাকে দিব্য প্রকাশের সাথে জড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল একটাই, আর সেটা হলো ইশতিয়াক ভাই ও নাগরীর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমাদের মধ্যে অংশীদারিত্বের দলিল সম্পাদিত হলো। ইশতিয়াক ভাই আর নাগরী কি পরিমাণে বা কি হিসেবে টাকা দিয়েছিল সেটা আর নাই বা বললাম। তবে তাদের সাহায্য না পেলে হয়তো দিব্যপ্রকাশের যাত্রা শুরু হতোনা। এবি ব্যাংক কাকরাইল শাখায় দিব্যপ্রকাশের একটা হিসাবও খোলা হলো, আমার আর সাবেরের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যবসাও শুরু হলো। এর ক’দিন পরেই সাবের তার পিত্রালয় বিক্রির টাকা হাতে পেলো অনেক (পরিমাণটা জানিনা)। তারপর, ১৯৯১ সালেই সম্ভবতঃ, কাইউম পল্লব-এর চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সাবেরের সাথে অংশীদারিত্বে শান্তিনগরে একটা বইয়ের দোকান খুলে বসলো। নাম হলো কাশফি (কাইউমের মেয়ের নাম কাশফি)। কাশফিতে আমার কোন অংশ ছিলনা, কোন প্রয়োজনও ছিলনা। কারণ, তখন সাবেরদের হাতেই অনেক টাকা। সাবের আর কাইউমের সেই মধুরেণ সম্পর্ক এখন আর নেই। কারণ, এখন সম্ভবতঃ কাশফিতেও সাবেরের আর প্রয়োজন নেই। ওদিকে আমি অস্ট্রেলীয় দূতাবাসে যোগ দেবার পর একদিন সাবের চেকে আমার স্বাক্ষর নিতে এলে সাবেরকে বললাম, “তুই দিব্য”র অ্যাকাউন্ট থেকে স্বাক্ষরকারী হিসেবে আমার নামটা বাদ দে। কারণ, আমি তোদের কোনই কাজে এখন আর আসিনা। তাছাড়া আমার চাকুরীও একটা বাধা এই প্রকাশনার সাথে যুক্ত থাকার জন্যে।” সাবের নেতিবাচক মনোভাব দেখিয়ে চলে যায়। কিন্তু, তারপর সাবের আর কখনো আমার স্বাক্ষর নিতে আসেনি। দিব্যপ্রকাশ এখন বেশ বড়োই হয়ে গেছে, সাবেরের ছেলে দিব্যর মতো। কিন্তু, দিব্য প্রকাশের কোথাও আমার নামটা আছে কি না জানিনা। দিব্য এখন সাবেরের এবং কাশফি এখন কাইউমের। তারপরও কাইউমের সাথে আমার সম্পর্ক চলেই যাচ্ছিল। সম্পর্কটা কাঁটায় পরিণত হলো আমি অস্ট্রেলীয় দূতাবাস ছাড়ার পর থেকেই। কারণ, তখন আমি আর পরিচিত ও কাজের জন রইলামনা। এসম্পর্কে ভবিষ্যতে আরো বলবার ইচ্ছে রইলো।

কাইউম যথেষ্ট বুদ্ধিমান তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই কারণেই পড়াশোনার খামতি থাকা সত্ত্বেও করে-কর্মে খাচ্ছে ভালোই। পিতার সম্পত্তি থেকে (ত্যাজ্য হবার কারণে) বঞ্চিত হলেও পুরোনো টাকার হোসেনীদালানে মামার বাড়িতে একটু খানি জায়গার ওপর পাঁচতলা এক বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে তার কষ্টার্জিত টাকা দিয়েই। কাইউম একসময় ছিল আমার হরিহর আত্মা। সেই কাইউম-এর কাছে আমার মূল্যমাণ বর্তমানে বোধহয় শূন্যাতকেরও নিচে নেমে গেছে। যোগাযোগ নেই অনেক মাস। সম্প্রতি আমার প্রায় আট মাসের অসুস্থতার সময় কাইউম একবারো সময় পায়নি আমার খবর নেয়ার। অথচ, আমি অস্ট্রেলীয় দূতাবাসে থাকাকালে আমার অনুষ্ঙ্গ তাদের যে কোন কিছুর জন্যেই একেবারে বাধ্যতামূলক ছিল। সম্ভবতঃ আমার বর্তমান আর্থিক দৈন্য তাদের উৎসাহিত করেছে সম্পর্ক আর না গড়ানোর জন্যে।

কাইউম ক’দিন আগে আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারলো, আমার দুটো প্রকল্পের জন্যে বেশ অনেক টাকা ব্যাংক ঋণ পেয়েছি। আমার এক ছোট বন্ধু ও ভাই কাজল-এর কাছে প্রথমে কাইউম তার অ বিশ্বাস প্রকাশ করলেও পরে বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করে নিয়ে নাকি জিজ্ঞেস করেছিল, “ব্যাংকের টাকা সে শুধাবে ক্যামনে”। কাজল বোধহয় আমাকে এই কথা জানিয়ে আমার কোন প্রতিক্রিয়া আশা

করেছিল। আমি মৃদু হেসে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি। আজ বলতে চাই, “আমিতো অশিক্ষিত, গভনূর্খ। কোন মেধা নেই আমার, নেই কোন যোগ্যতাও। ঢাকায় বাবার বাড়ি নেই, নেই মায়েরও বাড়ি। ঢাকায় একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছি বাটপারি করে, সুদের ব্যবসা করে এবং মানুষকে ঠকিয়ে। আরো কিছু সম্পত্তি ও কটেজ বানিয়েছি গাজীপুরে একই উপায়ে। সেই ভাবেই ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হয়েছি ১৯৯২ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে, বিশ্ব ব্যাংক ইন্সটিটিউটের ফেলো হয়েছি ২০০২ সালে, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট অব এনভায়রনমেন্টাল ইকনমিক্সের ফেলো হয়েছি, এবং কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট-এর হাত থেকে একটি পলিটিক্যাল এনথোলজির জন্যে তাদের রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদক নিয়েছি ১৯৯২ সালে। এখন সেফারওয়ার্ল্ড, ইউকে-এর সাথে কাজ করছি গবেষণা অংশীদার হিসেবে। এই সবই সম্ভব হয়েছে আমার বাটপারি ও লোক ঠকানো বিদ্যার কারণে। ৫৩ বছর যখন এভাবেই কাটাতে পেরেছি, আরো ক’টা বছর এরকম বাটপারি করেই কাটিয়ে দিতে পারবো এবং এখন ব্যাংকের টাকা মেরে দেবো।” জানিনা আমার এই উত্তরে কাইউমের মনে স্বস্তি জাগবে কি না। তবে, অনেকেই পুলকিত হবেন আমাদের এই অধঃপতনে। কারণ, তারা তো বাস্তবতাটা জানেন। বাংলাবাজার পত্রিকার বার্তা সম্পাদক থাকাকালে, অস্ট্রেলীয় দূতাবাসের সিনিয়র অফিসার থাকাকালে এবং লিপস-এর পরিচালক (কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স) থাকাকালে কাইউম এবং ওই জাতীয় বন্ধুদের কাছে আমি ম্যাটিনি আইডল ছিলাম। ওই পদবীগুলো না থাকার কারণে এখন আমার মূল্যমাণ নেমে গেছে শূন্যাতকেরও নিচে। এটাই হলো বাস্তব।

কাইউমদের কথা আবারো বারবার আসবে। কারণ সম্পর্কটাতো ছিল অনেক দীর্ঘসময়ের। বলবো এক ডালিয়া নিলুফারের ও তার আত্মজনের কথা। এরকম অনেক কথাই লিখতে হবে। কিন্তু, এক জীবনের সব কথাই কি লেখা সম্ভব? মোটেওনা। তবু, যতোটুকু সম্ভব সত্যাচারে জীবনের কিছু নিষ্ঠুর উচ্চারণ এবং মধুর কথনেরও উদ্ভাস রেখে যেতে চাই। হয়তো জীবনাবসানে এটাই একটি মূল্যবান সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে যেতে পারে, এটাই আশা।

আবারো বলছি, মনুষ্য দর্শনে আমি যাই লিখিনা কেন তার সব কিছুই দায়ভার আমার। কর্নফুলির প্রধান সাম্পানওয়াল বা তার সহকর্মীদের এর কোন বিষয়ের জন্যে দায়ী করা যাবেনা, এটা প্রথমেই জানিয়ে রাখছি। এই লেখার কোন কিছুই কারো কাছে বিসদৃশ মনে হলে বিন্দু মাত্র দ্বিধা না করে আমাকে জানালে অত্যন্ত খুশী হবো। তাছাড়া এই লেখায় কেবল নেতিবাচক কথাই থকবে তাও নয়। অনেক সুন্দর মানুষের কথাও থাকবে, যাদের কথা জানলে অনেকে অনুপ্রাণিতও হতে পারেন।

প্রিয় পাঠক, আপনাদের পরামর্শ অতি অবশ্যই আমার এই লেখাকে সমৃদ্ধ করতে যথেষ্ট সহায়ক হবে। তাই আপনাদের মূল্যবান সময় থেকে কিছুটা সময় নাহয় আমাকে ঋণ হিসেবেই দিলেন। আন্তর্জালের মাধ্যমে আপনাদের সাথে আরো সরাসরি যোগাযোগ রাখার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। অলমতি বিস্তরণে।

চলবে

হিফজুর রহমান, ঢাকা, ৬ অক্টোবর ২০০৬

E-mail: hifzur@dhaka.net

লেখকের পূর্বের লেখাগুলো পড়তে এখানে [টোকা মারুন](#)